Vol. 52 | No. 1 | 2014

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আত্মনির্মাণে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল

Volume	52
Issue	1
Year	2014
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রোকসানা গুলশান
Published online	October 1, 2014
DOI	10.62328/sp.v52i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i1.7
Pages	১৮১-১৯৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আত্মনির্মাণে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল

Check for updates

রোকসানা গুলশান*

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ - ১৯৪১) ছোটগল্পসমূহের[১] মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র' (১৯১৪) অন্যতম মনস্তাত্ত্বিক গল্প। এই গল্পের প্রধান নারী চরিত্র মৃণাল, মেজোবউ-এর জীর্ণ খোলস ছিন্ন করে আবিষ্কার করেছিল নিজেকে ব্যক্তিমানুষ হিসেবে। সাতাশ বছরের মৃণাল কলকাতার সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলির নিরাপত্তা ছেড়ে মুক্তি খুঁজেছিল উন্মুক্ত আকাশের নিচে। সে আকাশ বৃহৎ পৃথিবীর আকাশ, তার আপন আকাশ। বাঙালি সমাজের বহুকাল লালিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পতাকা উড়িয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে মৃণাল দুজন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের মৃণাল ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *গৃহদাহ*[২] (১৯২০) উপন্যাসের মৃণাল। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্ত্রী ভবতারিণীর[৩] নাম পাল্টে রেখেছিলেন মৃণালিনী দেবী। নামটি রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রিয় নাম 'নলিনী'র[৪] প্রতিশব্দ। তিনি বিভিন্ন অনুষঙ্গে নামটি ব্যবহার করেছেন। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের মধ্যে আধুনিক নারীর যে প্রতিবাদী স্পৃহা তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ, সেটা তার এই প্রিয় নামকে উল্লেখ করে উপস্থাপন করা হয়েছে। একথা স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম ছিলেন। তাই 'মৃণাল' শুধু একটি নারী চরিত্র হিসেবে থাকল না, এটা যেন রবীন্দ্রনাথের নিজেরও প্রতিবাদ। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত *সবুজপত্র*[৫] পত্রিকার শ্রাবণ ১৩২১ সংখ্যায়। চলিত ভাষারীতিতে[৬] লেখা 'এই গল্পে নারীর অধিকার ও স্বাধীনতাকে ভিন্নমাত্রায় উপস্থাপন করেন রবীন্দ্রনাথ' (সৌমিত্র, ২০১২ : ৮৮)। পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে এ গল্প তুলে ধরা হয়েছে। মৃণালের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রচলিত সমাজবিধির প্রতি কখনো বেদনায়, কখনো তিরস্কারে, কখনো ব্যঙ্গে জ্বলে উঠেছে (নীপা, ২০০৪ : ৮৮)। রবীন্দ্রনাথের তেপ্পান্ন বছর বয়সে লেখা এই গল্পেই ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে 'নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকার সর্বপ্রথম খোলাখুলিভাবে দাবী করা হয়' (হুমায়ুন, ২০০০ : ৬৯)। গল্পটি রচনার শতবর্ষে আজকের সামাজিক প্রেক্ষাপটেও গল্পটির প্রাসঙ্গিকতা অনেকখানি। এই পাঠে মৃণাল কীভাবে নিজের স্বাধীন মানবসত্তাকে আবিষ্কার করে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে উঠেছিল তা বিশ্লেষিত হয়েছে।

আত্মনির্মাণ একটি জটিল প্রক্রিয়া। মানুষ প্রতিনিয়ত নিজেকে নির্মাণ করে চলে। জীবনের বিভিন্ন স্তরে ব্যক্তির অভিজ্ঞতার নির্যাসে এই নির্মাণক্রিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে বিনির্মিত হয়। এক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন, অর্থাৎ চিত্তের স্বাধীনতাতেই প্রকৃত মুক্তি ঘটে। প্রতিটি মানুষই আলাদা অনন্য ব্যক্তিসত্তার অধিকারী। তাত্ত্বিকেরা এই ব্যক্তিসত্তাকে সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং দার্শনিক প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেন। সমাজতাত্ত্বিকেরা সমাজের শ্রেণিকাঠামোকেই ব্যক্তির সত্তা নির্মাণের জন্য দায়ী বলে মনে করেন। অস্তিত্ববাদী

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, ঢাকা।

দার্শনিকেরা ব্যক্তিক স্বাধীনতা-মর্যাদা-অস্তিত্বকে কেন্দ্র করে একটি দার্শনিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। ডেনমার্কের সোরেন কিয়েৰ্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫), জার্মানির কার্ল জেসপার্স (১৮৮৩-১৯৬৯), ফ্রান্সের জ্যাঁ পল সার্ত (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০), রাশিয়ার ফিওদোর মিখাইলোভিস দস্তয়ভস্কি (১৮২১-১৮৮১) প্রমুখ এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মতে, "মানুষের কোনো সার্বিক সত্তা নেই। সে নিজে যা হয়ে ওঠে, শেষ পর্যন্ত সে তা-ই" (সৌভিক, ২০০৬ : ২০)। মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতি ক্ষেত্রে নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, সে অনুসারে মানুষ নিজের 'আমি'কে নির্মাণ করে, এই আত্মবিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিসত্তা নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে ব্যক্তি যেহেতু স্বাধীন সেহেতু সে নিজের ও সমাজের প্রতি একভাবে দায়বদ্ধ। স্বাধীন সত্তা দিয়ে ক্রমান্বয়ে নিজেকে নির্মাণ করতে গিয়ে ব্যক্তি মৃত্যুর মুখোমুখি হলেও তাকে পরোয়া করে না। আমরা তাই বলতে পারি, ব্যক্তির অন্তঃসত্তা ও বহিঃসত্তার নিরন্তর সংঘাতে এই ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। একজন ব্যক্তি নিজে কখনোই সামঞ্জস্যময় আত্মসম্পূর্ণ মানুষ নয়, 'গোটা একজন মানুষ অনেকসময় আমরা ধরতেই পারি না কতখানি টুকরো টুকরো হয়ে আছে আমাদের সব সময়ের অস্তিত্বে, যে টুকরোগুলির মধ্যে কেবলই দেওয়া-নেওয়া চলছে ভিতরে ভিতরে' (শঙ্খ, ২০১৪ : ৩৮), এইসব ব্যক্তিগত আমি থেকে বিন্দু বিন্দু নির্যাস পেয়ে তৈরি হয় 'আত্মগত আমি' (Central-I), স্পেন্ডার যার নাম দিয়েছেন Composite Self যা ক্রমাগত পরিণতির দিকে পরিবর্তিত হয়। "যেটা ego তারও আছে পরিণতি — বলেছিলেন ফ্রয়েড। সেই পরিণতি বা পরিবর্তন ঘটছে কিসের টানে? কোন আকর্ষণে? তার ভিতরে আরো কি পূর্ণতর কোনো আমি-র বোধ জেগে আছে, সম্পূর্ণতার কোনো বোধ? রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেন 'বড়ো-আমি'? ... এক প্রান্তে এই বড়ো আমি, একপ্রান্তে ব্যক্তিগত আমি। এর মাঝখানে রইল আমাদের ক্রমজায়মান আত্মগত পরিচয়" (শঙ্খ, ২০১৪ : ৩৮)। 'আমরা বারবার মৃত্যুবরণ করি, বারবার জন্ম লই, বারবার জেগে উঠি একদা এক রাজ্যে, এক জীবনে অনেকগুলো জীবন আমরা পাই, আর ওই বারবার মৃত্যু ও জীবনের লিখনেই আঁকা হয়ে ওঠে আমাদের ভেতর মানচিত্রটি' (সৈয়দ, ২০১৪ : ১০০)। এই সুপার পারসোনালিটির গুণেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য। 'আমাদের অন্তরস্থ চেতনা দ্বারাই আমরা উদ্বুদ্ধ ও চালিত হই যা নিছক ব্যক্তিময় নয়। এই চেতনার মধ্যে সক্রিয় থাকে দেশ-কাল-ভাষা ও কাব্যাদর্শের বর্হিজগৎ, থাকে মানববুদ্ধি ও অভিজ্ঞান, সবকিছুই যার উত্তরাধিকার বহন করে' (আকতার, ২০১৪ : ৫)। মানুষের ধর্মই হলো আত্মপ্রকাশিত হওয়ার ধর্ম। 'সমচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান প্রতিটি ব্যক্তিত্বের অন্বিষ্ট' (সর্বাণী, ২০০৭ : ১০৬)। অন্যের অনুভবে নিজেকে সত্য করে তোলাতে ব্যক্তি একরকম নির্বাণ লাভ করে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি মিশে যেতে পারে সমগ্র বিশ্বমানবে, বিশ্বপ্রকৃতিতে। প্রাবন্ধিকের মতে :

> ব্যক্তি আমি বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলিত হয়ে আপনার বড়ো আমিকে চরিতার্থ করে। এ হচ্ছে ইনডিভিজুয়াল থেকে সুপার পার্সোন্যাল হয়ে ওঠা, তাতে মৃত্যুভয়-অস্তিত্বভয়, লোকভয় অতিক্রম করে পাওয়া যায় পিতাকে, সখাকে, স্বামীকে, কর্মের নেতাকে,পথের চালককে, এবং লাভ করা যায় বিরাটের চিন্ময় পরিচয়। অর্থাৎ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় অনির্বচনীয়তা, মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় চিন্ময়তা তথা জ্ঞানময়তা। (আকতার, ২০১৪ : ১০)

অস্তিত্ববাদী সাহিত্য ব্যক্তির মৌল জীবনবোধের কথা বলে, 'সমকালীন সমাজ, জীবন ও মানুষের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে, ব্যক্তিমানুষকে জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল, দায়বদ্ধ, ক্রিয়াশীল ও জীবন্ত হতে শেখায়' (মাসুদ, ২০১৪ : ১৬৭)। জ্যাঁ পল সার্তের মতে, 'মানুষের জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনের চাইতে তার নিজেকে খোঁজা ও অনুধাবন করাটাই জরুরি। কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকলেও তিনি মানুষকে রক্ষা করতে অক্ষম। এই দিক দিয়ে অস্তিত্ববাদ আশাবাদী মতবাদ এবং এই মতবাদ সক্রিয়তায় বিশ্বাস করে' (সৌভিক, ২০০৬ : ২০৯)।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালও জীবনের প্রতি ইতিবাচক মনোভাবে ক্রমান্বয়ে নিজেকে নির্মাণ করে তোলে। সংশয়াচ্ছন্ন জীবন থেকে আত্মপ্রত্যয়ী মুক্তির জীবনে তার উত্তরণ ঘটে। তার পারিপার্শ্বিকতা, দ্বন্দ্ব-অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসহায়ত্ব, তাকে জাগ্রত করে। তার সংবেদনশীল মন তাকে জীবন নির্মাণের বন্ধুর পথ পাড়ি দিতে সাহস যোগায়। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের বুদ্ধি ছিল, কবিতার প্রতি অনুরাগ ছিল, নিজের সৌন্দর্যের প্রতি একরকম আত্মবিশ্বাস ছিল, মা হওয়ার বেদনা ছিল, সমবেদনশীল মন ছিল কিন্তু ছিল না পরিবারে তার আদর, প্রতিভার কোনো কদর। সবকিছুর সঙ্গে আপস করে কেটে যাওয়া মর্যাদাহীন দিন একসময়ে বদলে যায়, মৃণালের জীবনে আলোর বার্তা নিয়ে আসে বিন্দু নামের নারী। তার আয়নায় মৃণাল নিজের স্বরূপ খুঁজে পায়। তাই সংকীর্ণ গণ্ডীর অপূর্ণ মেজোবউয়ের অপমানিত জীবন থেকে বাইরে এসে সে বিশ্বলোকের আনন্দলোকে স্বাধীনভাবে মৃণাল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই চলে যাওয়া এবং অন্যের দর্পণে নিজেকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়েই মৃণাল বাস্তবতার সত্য রূপ খুঁজে নেয়।

দুই

ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের অন্তরের ভাবনা তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, গান, কবিতা, ছবি সর্বোপরি ছোটগল্পে প্রকাশিত। এসবের মধ্যে নারীর সামাজিক অবস্থানের এক ধারাবাহিক চিত্র পাওয়া যায়। 'রবীন্দ্রনাথের নারী 'পুরাতনী' মানসভ্রমণ শেষে নতুন সভ্যতা সৃষ্টির কারিগর মাত্র নয়, নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হয়। এতে সংসারের সীমা আছে, আছে পুরুষের রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির সান্নিধ্য, তবে সবচেয়ে বেশি আছে নারীর আত্মিক জাগরণ। রবীন্দ্রনাথ নারীর জন্য চেয়েছেন কর্মপথ ও সামাজিক পরিসর' (সিরাজ, ২০১২ : প্রসঙ্গত)। 'রবীন্দ্রনাথের নারী বিষয়ক ভাবনা (সেই সঙ্গে পরোক্ষে কিছুটা পুরুষবিষয়ক ভাবনাও) সংক্ষেপে বুঝে উঠতে চাইলে স্পষ্টতই চোখে পড়ে বিষয়টির বহুমাত্রিক[৭] চরিত্র। সেখানে স্ববিরোধিতার প্রকাশও অস্পষ্ট নয়' (আহমদ, ২০০৩ : ৪৫)। পিতা দেবেন্দ্রনাথের ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির আলোকিত প্রভাব তাঁর চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়া নোবেল পুরস্কার[৮] প্রাপ্তিও রবীন্দ্রমানসে বিরাট পরিবর্তন এনেছিল বলে মনে করা হয়। তিনি যে অচলায়তনে আঘাত দিতে এতদিন দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, এই পুরস্কার সেকথা বলার আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল। 'সমকালীন বলাকা, পলাতকা, ঘরে বাইরে, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর, পাত্র ও পাত্রী, নামঞ্জুর গল্প, চোরাই ধন, ইত্যাদিতে নারীর অধিকার বোধ, তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সমাজের সংস্কার-গ্রস্ত অচলায়তনে দিয়েছিল

প্রচণ্ড আঘাত' (মজিরউদ্দীন, ১৯৯৪ : ১০২)। সাধনা যুগের পর এই *সবুজপত্রের* যুগেই চির নবীন কবির বিপ্লবী মন লিখল :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাচাঁ।
('সবুজের অভিযান', *বলাকা*, ১৫ বৈশাখ ১৩২১)

নোবেলপ্রাপ্তির কয়েকমাস পর "*সবুজপত্র* প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সমস্ত রুদ্ধ কথা নানাভাবে প্রকাশ পাইতে থাকে প্রথম বৎসরের প্রথম সংখ্যায় তাঁহার প্রবন্ধ 'বিবেচনা ও অবিবেচনা', কবিতা 'সবুজের অভিযান' ও গল্প 'হালদারগোষ্ঠী' যে একই ভাবকে নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছিল সেটি হইতেছে 'চরৈবতি চরৈবতি' আগে চল, আগে চল্ ভাই। রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই হিন্দুসমাজের স্থবির ধর্মকে আঘাত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। *সবুজপত্রের* যুগ হইতে সাহিত্যেও বিচিত্র রীতির মধ্য দিয়া তাঁহার এই মনোভাবের তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল" (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ৫১৪)। 'স্ত্রীর পত্র' তেমনি একটি ব্যতিক্রমী গল্প। সমালোচকের মতে :

> *সবুজপত্র* যুগের গল্পাবলীর মধ্যে যেসব সামাজিক সমস্যার পর্যবেক্ষণ আছে তন্মধ্যে সামাজিক-প্রথাপীড়ন থেকে নারীর মুক্তিচিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। 'স্ত্রীর পত্র' (শ্রাবণ ১৩২১/ ১৯১৪) তার আশ্চর্য বলিষ্ঠ প্রকাশ। সমসাময়িককালে ইয়োরোপের নতুন সামাজিক চেতনা কবি স্বচক্ষে দেখেছিলেন, বুঝেছিলেন এবং কবি চিত্তে তার স্পর্শ লেগেছিল। যে ইয়োরোপে একদিন নারীকে নরকের দরজা বলে ঘৃণা করত, সে কালের বিবর্তনে নারীর সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতাকে স্বীকার করল, মেনে নিল নারী-পুরুষের সমানাধিকার :
> 'What is permitted to men shall be permitted also to them. (মজিরউদ্দীন, ১৯৯৪ : ১০২)।

বহুল আলোচিত এই গল্পটি প্রকাশের পর 'রক্ষণশীল শিক্ষিত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে এ গল্প রচনার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যে অশোভন ধিক্কার জানানো হয়, প্রতিক্রিয়াশীল গল্প[১] লেখা হয় তা অবিশ্বাস্য' (আহমদ, ২০০৩ : ১৭১)। নারীর মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তাঁরা তখনও মেনে নিতে পারছিলেন না। আসলেই গল্পটি ছিল 'সামাজিক রক্ষণশীলতার মৌচাকে ঢিল পড়ার মত' (আহমদ, ২০০৩ : ১৭১)।

তিন

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের কাহিনিটি নিতান্তই একটি পারিবারিক কাহিনি। বাংলাদেশের দুর্গম পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মৃণাল। বারো বছর বয়সে পিতৃগৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কীভাবে শ্বশুরবাড়িতে মেজোবউ হিসেবে প্রবেশ করে এই মেজোবউয়ের আত্মজাগরণ ঘটল, কীভাবে সে 'চেতনার আমি'র মৃণাল হয়ে উঠল সেটাই এ গল্পের কাহিনি। হিন্দু বাঙালি ঘরের সংসারযাত্রার ছকে মেজোবউ একজন অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নারী। পনেরো বছর ধরে অনাদরে ও নিরানন্দে সংসার করে দৈনন্দিন জীবনকাহিনির রূপটি স্বামীর কাছে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে আবেগময় ভাষায় প্রকাশ করেছে সে। এটি তার স্বামীর কাছে লেখা

একমাত্র চিঠি। এটি যেন কোনো স্ত্রীর পত্র নয়, পুরুষের কাছে লেখা নারীর পত্র। এখানে মৃণাল নারীবাদী। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন একান্নবর্তী পরিবারে নারীরা যে পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক নির্যাতনে শোষিত হয়, তারই প্রতিবাদে সংবেদনশীল মৃণাল সংসার ছেড়ে নীরবে চলে যায়। চিঠির শেষদিকে মৃণাল সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীনভাবে বলেছে :

> আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরবোনা। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৫)

মৃণালের এই বেরিয়ে পড়া এক অসাধারণ সংগ্রামী পদক্ষেপ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠির ছত্রে ছত্রে মৃণালের উক্তির মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছেন। তাঁর মন্তব্যগুলো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোড়িত করে।

চার

নিজের মতো বাঁচার অধিকার প্রতিটি মানুষেরই আছে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো সে নিজেকে জানতে ও জানাতে চায়। এই 'আত্মঅন্বেষণ' ব্যক্তির 'হয়ে ওঠার' ইতিহাস। মানুষ অন্যের মধ্যে ও অনেকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত নিজেকে আবিষ্কার করে চলে। সময় ও পরিবেশে ব্যক্তির মানসিক ভিত তৈরি হয়। বহু 'আমি'র সংঘাতেই ব্যক্তিসত্তা বিবর্তিত হয়। 'সামাজিক আমি', 'নৈতিক আমি' এবং সবশেষে 'চেতনার আমি'র সংঘাতেই ব্যক্তিত্বের সুপ্ত জ্বালামুখ জেগে ওঠে — ভেতরের লাভা ফুটতে থাকে অগ্ন্যুৎপাতের অপেক্ষায় (সর্বাণী, ২০০৯ : ৭৭)। এটাই 'আমি'র সার্থকতা। কিন্তু এই আত্মঅন্বেষণ প্রক্রিয়া নারী ও পুরুষভেদে ভিন্ন হয়, কেননা সমাজে উভয়ের বেড়ে ওঠা বৈষম্যমূলক। 'সমাজ পরিকাঠামোতে নারীর জন্য নির্দিষ্ট স্থান গৃহ, এবং পুরুষের জন্য বাইরের জগৎ' (সর্বাণী, ২০০৭ : ১১৮)। সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ তার জীবন প্রসারিত করতে পারে, কিন্তু নারীর চেতনার পথ গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 'সামাজিক রাজনীতিতে নারী হারিয়ে ফেলে আপন সত্তা, সে হয়ে ওঠে সমাজের হাতের ক্রীড়নক। আত্মমর্যাদার স্বরূপ তার কাছেই অস্পষ্ট' (সর্বাণী, ২০০৭ : ১৩৩)। পুরুষ অর্থনৈতিকভাবে অনেকখানি স্বাধীন হলেও নারী বেশিরভাগ সময় স্বামী কিংবা স্বামীর পরিবারের ওপর নির্ভরশীল। সমাজ মনে করে, পুরুষের উপার্জন দিয়ে নারী গড়ে তুলবে শান্তির নীড়, আর সে থাকবে গৃহের সম্পত্তি হিসেবে অনেকটা অচেতন পুতুলের মতো। এমনি পরিবেশে নারীর মর্যাদা ব্যক্তি নয়, জড়বস্তুর সমতুল্য।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালের অবস্থাও অনেকটা সেরকম। রূপের জন্যই মৃণালের শাশুড়ি[১০] তাকে ঘরের শোভা বর্ধনকারী হিসেবে ঘরে এনেছিল, তার আর কোনো মূল্য স্বীকার করা হয়নি। "সব ক্ষেত্রেই নারী গৃহসজ্জায় বন্দী — তার রূপের ও সৌন্দর্যের প্রশংসায় তাকে ভুলিয়ে রাখা — এসব কিছুরই এক উদ্দেশ্য– নারীকে পরিপূর্ণভাবে পুরুষের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করা" (আহমদ, ২০০৩ : ২৬)। মৃণাল স্বামীগৃহে

নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নির্বিবাদে দিন অতিবাহিত করছিল। নিজের ঘরের ওপরও তার অধিকার জন্মেনি। তাই 'জগৎ এবং জগদ্বীশ্বরের' সঙ্গে তার অন্য সম্বন্ধকে সে ভুলতে বসেছিল।

সামাজিক ও পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, মৃণাল একজন প্রান্তিক নারী। সমাজের নির্ধারিত সংজ্ঞার নারী হওয়ার কারণেই এই প্রান্তিকতার শিকার। হুমায়ুন আজাদ তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

> শিশুকাল থেকেই শিশুরা পিতৃতন্ত্রের বিধানের শিকার হয়ে ওঠে। ছেলে শিশুকে করে তোলা হয় আধিপত্যবাদী, মেয়ে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলা হয় অধীন ও অপদার্থের বোধ। অ্যাডলারের মতে, বালিকা চারপাশে নারীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার দেখে দেখে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে নিজের আর নারীজাতির ওপর; এটা কোনো খোজা গূঢ়ৈষার ফল নয়, সমাজব্যবস্থাই তাকে করে তোলে আত্মঅবিশ্বাসী। নারীকে বের ক'রে দেয়া হয় শক্তির এলাকা থেকে, পুরুষের সমাজব্যবস্থা তার সাথে এমন দুর্ব্যবহার করে যে তার মনে দেখা দেয় সংকট। সমগ্র সভ্যতা নারীর ওপর যে-চাপ সৃষ্টি করে, তা নারীকে বাধ্য করে পুরুষের কাছে আত্মসমর্পণে। (হুমায়ুন, ২০০৫ : ১৬৯)

শিশু বয়স থেকেই মৃণাল জেনে যায়, নারী ও পুরুষের বৈষম্য কত নির্মম, কত মূল্যহীন নারীর জীবন। শৈশবে একবার সান্নিপাতিক জ্বর তাকে কাবু করতে পারেনি, মাঝখানে ভাইয়ের প্রাণ চলে যায় কারণ — 'চুরি বিদ্যাতে যম পাকা, দামী জিনিসের পরেই তার লোভ' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৪৮)। পরবর্তী সময়ে দেখি 'মেয়েমানুষের সংকোচ' নিয়ে পাত্রপক্ষের সামনে সে পরীক্ষা দিতে নামে। এখানে লেখক বিয়ে করতে যাওয়া বর ও বরযাত্রীদের পুরুষতান্ত্রিক দাপট ও কন্যাপক্ষের করুণ অসহায়তায় চিত্রকে তুলে ধরেন :

> বাবার বুক দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল, মা দুর্গানাম জপ করতে লাগলেন। শহরের দেবতাকে পাড়াগাঁয়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে। মেয়ের রূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর তো মেয়ের মধ্যে নেই, যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে যে দামই দেবে সেই তার দাম।... সেদিনকার আকাশের যত আলো এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়াগেঁয়ে মেয়েকে দুইজন পরীক্ষকের দুইজোড়া চোখের সামনে শক্ত করে তুলে ধরবার জন্যে পেয়াদাগিরি করছিল — আমার কোথাও লুকোবার জায়গা ছিল না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৪৮)

শৈশব থেকেই নারী সংকীর্ণতায়, সংকোচে বেড়ে ওঠে। 'এরকম সংকীর্ণতায় বড় হলে মানুষ কখনো পূর্ণাঙ্গ মানবিক হতে পারে না। এজন্যেই মৃণালের মা, মৃণালের জা এবং বিন্দুর শাশুড়ির মতো মানুষ বেশি। আর যারা নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কথা চিন্তা করে; নিজেরা মানুষ হতে চায়, তাদেরকে সমাজ গালমন্দ করে' (মাহফুজা, ২০১১ : ২১)।

মৃণাল বুদ্ধিমতী, এজন্য সংসারে প্রশংসার পরিবর্তে 'মেয়ে জ্যাঠা' বলে কটুকথা সহ্য করতে হয়েছে তাকে। মেয়েদের বেশি বুদ্ধি থাকাটা জরুরি নয়, এটা যেন 'বালাই', অপ্রয়োজনের। কারণ সমাজে মেয়েদের বুদ্ধিকে সচরাচর প্রয়োগ করা হয় না। গল্পটিতে মৃণালকে বুদ্ধির ঝলকেই দেখি, গড়পড়তা বাঙালি ঘরের মেজোবউ বুদ্ধির শুভ্রতার জোরেই শুধু মৃণাল হয়ে ওঠে।

মৃণাল সন্তানহীন। তার কন্যাসন্তানটি আঁতুড়ঘরের অবহেলায় জন্মেই মারা যায়। তাই মাতৃত্বের দুঃখ সে পেয়েছে, কিন্তু পরিচয়টি সে পায়নি। সে বেঁচে থাকলে হয়তো তার জীবনের অন্য অর্থ হতো। 'সে যদি বেঁচে থাকতো তাহলে সেই আমার জীবনে যা কিছু বড়ো, যা কিছু সত্য, সমস্ত এনে দিত, তখন মেজোবউ থেকে একেবারে মা হয়ে বসতুম' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭: ৪৪৯)। মৃণাল এক্ষেত্রে অন্দরের অনাদরের পরিবেশকে চিহ্নিত করতে গিয়ে বলে :

> ঘরে সাজসজ্জা — আসবাবের অভাব নেই। অন্দরটা যেন পশমের কাজের উল্টো পিঠ; সেদিকে কোনো লজ্জা নেই, শ্রী নেই। সেদিকে আলো মিটমিট করে জ্বলে, হাওয়া চোরের মত প্রবেশ করে। উঠোনের আবর্জনা নড়তে চায় না, দেয়ালের এবং মেজের সমস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৪৯)

এই অন্দরেই নারীদের বসবাস। যেখানে তাদের সুস্বাস্থ্য, পছন্দ-অপছন্দ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। সেখানে 'ঘোরো আইন দিয়ে গড়া কাঁটার বেড়া'র মধ্যে নারীকে বাধা মেনে দুঃখে-অপমানে একরকম বন্দী জীবনযাপন করতে হয়।

পরিবারে মৃণালের খাওয়াপরার কোনো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তার মনের বৃত্তিগুলো বিকাশের পথে বাধা ছিল। মৃণাল কবি, কিন্তু সেই কবিসত্তাকে সে লুকিয়ে রাখে। এতে কারো আগ্রহ নেই, প্রশংসা তো দূরের ব্যাপার। সে যখন সহানুভূতিশীল মন নিয়ে গৃহপালিত পশুর প্রতি সদয় হয়, তখন তার গোত্র নিয়ে ঠাট্টা করা হয়। আর পাঁচজন পরনির্ভরশীল নারীর মতোই মেজোবউয়ের দিন গতানুগতিক কেটে যাচ্ছিল। 'আলগা মাটির উপর যেভাবে ঘাস বেঁচে থাকে' সেভাবে অতিবাহিত হওয়া জীবনের কাছ থেকে তার কিছু চাওয়ার নেই, মৃত্যুকেও তার ভয় নেই। মৃণাল বলে, "জীবন আমাদের কী-ই-বা যে মরণকে ভয় করতে হবে?" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৪৯)।

পাঁচ

অন্দরমহলের মেজোবউ বদলে যায়। পাঁচিলঘেরা ঘেরাটোপের ভেতর থেকে তাকে মুক্তস্বরূপ চিনতে শেখায় বিন্দু নামের এক চোদ্দ বছরের কিশোরী। তার সংস্পর্শে এসেই মৃণাল নিজেকে পরিপূর্ণভাবে দেখতে পায়। নিজের অবস্থানকে বুঝতে পেরে, মৃণাল পদ্মের পাপড়ির মতই ধাপে ধাপে জেগে ওঠে। আর সে মানসিকভাবে পীড়িত হতে চায় না, হীনম্মন্যতায় সংকুচিত থাকতে চায় না। বিন্দু তার বড় জায়ের অনাথ বোন। খুড়তুতো ভাইদের অত্যাচার-নির্যাতনে আশ্রয়হীন এই মেয়েটির প্রতি পরিবারের অবহেলা তাকে সচেতন করে তুলল। বিন্দু ছিল সংসারের এমনই একজন অকিঞ্চিৎকর 'অনাবশ্যক মেয়েমানুষ' 'পড়ে গিয়ে সে যদি মাথা ভাঙত তবে ঘরের মেজেটার জন্যই লোকে উদ্‌বিগ্ন হত' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫০)। বিন্দু দেখতে 'মন্দ ছিল'। খুড়তুতো ভাইয়েরা তাকে ঘরের একটি কোণেও রাখতে নারাজ। হীনম্মন্যতায় তার এই প্রান্তিকায়িত অবস্থান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বিশ্বসংসারে তার জন্মাবার কোন শর্ত ছিল না; তাই সে কেবলই পাশ কাটিয়ে চোখ এড়িয়ে চলত' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫০)। 'এই সমাজ একজন মানবিক

গুণসম্পন্ন নারীকে ক্রমে সৌন্দর্যমিথের মধ্য দিয়ে নানা প্রক্রিয়ায় নারীতে রূপান্তর করে। সেই কাল্পনিক ভাবমূর্তির খোলসে মেয়েটি একসময় বন্দি হয়ে পড়ে' (আবুল, ২০০১ : ১২৯)। অসহায় বিন্দুকে এ বাড়িতে 'দাসীবৃত্তিতে' দেখে মৃণালের 'দুঃখ' ও 'লজ্জা' হয়। 'নিজের জন্য তার দুঃখ ছিল না, কিন্তু বিন্দুর অবমাননা সে সইতে পারেনি' (অনীক, ২০০০ : ৭৪)। তাকে নিজের ব্যক্তিত্বের জোরে মাতৃস্নেহে আশ্রয় দিতে গেলে, সংসারে অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাতেও মৃণাল অবিচল থাকে। বিন্দুর ভাষা সে বুঝতে পারে। মূলত বিন্দুর মনের সৌন্দর্যের সংস্পর্শে এসেই মৃণালের সৃষ্টিশীল মনের এবং বিদ্রোহী সত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* (১৯২৯) উপন্যাসের কুমুদিনীর মধ্যেও আত্মজাগরণ ঘটেছিল, মধুসূদনের সংস্পর্শে এসেই 'সে উপলব্ধি করে, এমন কিছু আছে যা সন্তান থেকেও বড়– তার আত্মমর্যাদা,স্বাধীনতা যা তার আত্মিক মুক্তির নামান্তর' (সর্বাণী, ২০০৭ : ১৩৪)। অন্যদিকে *শেষের কবিতার* (১৯২৯) 'লাবণ্যর সৃষ্টিশীল মনের প্রসারণ ঘটেছিল অমিতের সংর্স্পশে এসে' (সর্বাণী, ২০০৭ : ১৪১)। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের বিন্দু ছিল মৃণালের কাছে, 'একটুখানি জীবনের কণা'র মত। 'বাতাসে সামান্য একটা বীজ উড়িয়ে নিয়ে এসে পাকা দালানের মধ্যে অশ্বত্থ গাছের অঙ্কুর বের করে শেষকালে সেইটুকু থেকে ফাটল শুরু হল।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫০) বিন্দুকে নিজের কাছে আশ্রয় দিতে গিয়ে দেখল, 'আশ্রয়ের দরকার যার বেশি, আশ্রয়ের বাধাও তার তেমনি বিষম' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫১)।

সে বাধা রুখতে প্রতি ক্ষেত্রে তাকে সজাগ হতে হয়েছে। পরিবারে অন্য সকলের 'খুঁতখুঁত খিটখিটের' বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। বিন্দুর পেছনে মৃণালের খরচ বেড়ে যাওয়ায় মৃণালের স্বামী হাতখরচ দেয়া বন্ধ করে দেয়। এ সময় আত্মসম্মান থেকে নিজেকে রক্ষা করতে মৃণাল পাঁচসিকে দামের জোড়া মোটা কোরা ধুতি পরতে আরম্ভ করে। তার ভাষ্য হলো, 'আমি সকল দিকে আপনাকে অসম্ভব খাটো করতে পারিনে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫০)।

সমব্যথী মৃণালের কাছে সংসারের অবাঞ্ছিত বিন্দু বেশি দিন থাকতে পারল না। তাকে জোর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে না দিলেও, 'বাড়ির আপদ'কে বিদায় করার অন্য পথ বের করল। বিন্দুর অমতে, এমনকি মৃণালের অজান্তে তারা তাকে এক মানসিক প্রতিবন্ধীর সাথে বিয়ে দিল। বিয়েকে সে রোধ করতে পারেনি, এখানেই তার অসহায়ত্ব। 'বিন্দুর জন্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু ওর বিবাহ বন্ধ হোক এ কথা বলবার সাহস আমার হল না। কিসের জোরেই বা বলব। আমি যদি মারা যাই তো ওর কি দশা হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫২)। বিন্দুর এমন বিরূপ পরিস্থিতিতে, অমানবিকতার বিরুদ্ধে মৃণাল তীব্রভাবে তার পক্ষে লড়ে যায়। পুরুষতান্ত্রিক দাপটে তখন বলা হয় 'ছেলে হোক না পাগল, সে তো পুরুষ বটে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৩)। এসময় কয়লা রাখার ঘরের পাশে ভেড়ার ঘরে আশ্রয় নেয়া পালিয়ে আসা ভীত হরিণের মতো বিন্দুকে মৃণাল সাহসের সাথে আশ্বাস দিয়ে বলে, 'তুই যেমন ছিলি তেমনি আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিতে পারে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৩)। কিন্তু এত কিছুর পরও শেষ রক্ষা হয় না। আত্মসংকুচিত বিন্দু নিজেকে ও মৃণালের সম্মান বাঁচাতে বেছে নেয় আত্মহত্যার

পথ। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্র ছোটগল্পে 'তুলনামূলকভাবে নারী চরিত্রের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি' (ফাতেমা, ২০০৩ : ১৪৪)। বিন্দুর মৃত্যুকেও সমাজ সুনজরে দেখল না। বিন্দুর এই করুণ পরিণতি মৃণালকে নতুন করে ভাবতে শেখায় "বিন্দু নামের কিশোরীর জীবনের বিনিময়ে দাম্পত্য সম্পর্ক ও পরিবারতন্ত্রের অন্ধকারে লুকানো সব ছেদ টেনে বের করে এনেছেন" (আহমদ, ২০০২: ১৭২)। মেজোবউয়ের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা অসহনীয় হয়ে ওঠে। তার ভেতরের সত্তা তাকে বিদ্রূপ করতে থাকে। 'তোমার এমন ভুবনে আমার জীবন নিয়ে কেন ঐ তুচ্ছ ইটকাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতেই হবে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৫)।

এভাবে বিধাতার সঙ্গে বোঝাপড়া যেন, তার নিজের চেতনার সঙ্গে বোঝাপড়া। এরপর সে নিজেই নিজের পথ খুঁজে নেয়। তার 'চেতনার আমি' তাকে হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি দিয়ে, নিজের ব্যক্তিসত্তা-কে (self) চিনতে শেখায়। তাই আত্মমর্যাদা নিয়েই সে বাঁচতে চায়। সামাজিক প্রথার অন্ধ আনুগত্য থেকে বেরিয়ে নিজের পছন্দে মানবজীবন বেছে নেয়ার স্বকীয়তায় উত্তরণই মৃণালের ব্যক্তিত্বের মূলকথা। 'সবলা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
> কেহ নাহি দিবে অধিকার।
> হে বিধাতা?
> নত করি মাথা
> পথপ্রান্তে কেন রব জাগি
> ক্লান্তধৈর্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি
> দৈবাগত দিনে। ('সবলা', *মহুয়া*, ২৩ অগস্ট ১৯২৮)

আবার *শ্যামলী* কাব্যের 'বাঁশীওয়ালা' কবিতায় বাংলার নারী বাঁশীওয়ালাকে চিঠি লিখেছিল —

> আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
> সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেননি
> আমাকে মানুষ করে গড়তে —
> রেখেছেন আধাআধি করে।
> ('বাঁশীওয়ালা', *শ্যামলী*, ১৬ জুন ১৯৩৬)

'চৈতন্যরূপ বাঁশীওয়ালার ডাক তাই অমর্ত্যলোকের নির্দেশনা। এখানে নেই মাথা নত-করা স্বীকৃতি। আত্মপরিচয়ে ধন্য হতে চায় নারী' (সিরাজ, ২০১২ : ৭০)। মৃণালের চৈতন্য এর চাইতেও উর্ধ্বে, নিজেকে সে অর্ধমানব ভাবতে নারাজ। লক্ষ্য জেনেই সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষ মাত্রই সম্ভাবনাময়। মৃণালও সেই সম্ভাবনাকে চিনে নিতে চায়। তাই চিঠির শেষে, মেজোবউয়ের পরিচয় ত্যাগ করে আত্মবিশ্বাসে লিখতে পারে, 'আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম। তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন মৃণাল' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৬)। এখানেই সে 'মৃণাল' নামটি ব্যবহার করে। সে এখানে ব্যক্তিমানুষ। কারও কন্যা, স্ত্রী কিংবা মাতা নয়। সিমন দ্যা ব্যোভেয়ার[১১] (১৯৪৯) বলেছেন — কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ নারীকে

নারী করে গড়ে তোলে। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধের যে আয়নাতে সে এতদিন নিজেকে দেখেছে, সেই আয়নাকে ভেঙে নিজস্ব প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছে। যে অধস্তন নারী প্রতিমার আবরণে তাকে আচ্ছাদিত করে রাখা হয়েছিল যুগের পর যুগ সেই আবরণ ভেঙে সে মুক্ত স্বরূপে নিজেকে ব্যক্তি হিসেবে নির্মাণ করে। মেজোবউ হয়ে ওঠে শুধুই মৃণাল। চিঠির শেষে 'মৃণাল' নামটির মধ্য দিয়ে তার দ্রোহ এবং আমিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে মৃণাল নামটিও জেন্ডার নিরপেক্ষ[১২] একটি নাম। যে নামটি নারী কিংবা পুরুষ যে-কোনো লিঙ্গেরই হতে পারে। মৃণাল এখানে শুধুই একজন ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের *যোগাযোগ* উপন্যাসের কুমুদিনী বলেছিল, 'আমি ওদের বড়োবউ, তার কি কোনো মানে আছে যদি আমি কুমু না হই?' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৪ : ১৩৩)। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালও মানসিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে চিঠির শুরুতেই জানায়, 'এ তোমাদের মেজোবউয়ের চিঠি নয়' । তারও স্বতন্ত্র পরিচয় ও স্বতন্ত্র সত্তা আছে। সেই নিজ ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা রক্ষার তাগিদেই মৃণাল ঘর ছেড়েছে।

ছয়

ইবসেনের[১৩] অপূর্ব সৃষ্টি নোরাও ঘর ছেড়েছিল। তাঁর বিখ্যাত *A Dolls House* (১৮৭৯) নাটকে তিনি দেখিয়েছেন, পুরুষতন্ত্র কীভাবে পুরুষের স্বার্থে নারীদের ঘরের ভেতরে আটকে রেখে তার আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দেয়। নাটকের প্রধান চরিত্র নোরা পুরুষতন্ত্রের জাল ছিন্ন করে, আপন ব্যক্তিত্বের প্রতি কর্তব্যবোধের তাগিদে স্বামী সন্তানদের রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে এসেছিল। নোরার এই বেরিয়ে আসাকেই নারীমুক্তির সরণি মনে করা হয়। নোরা তার স্বামীর কাছে পুতুলসদৃশ ছিল, যাকে ফন্দিফিকির করে বাঁচতে হয়। নোরা নিজেও সেরকম জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে সে 'নারীপুরুষের সম্পর্কের গ্রন্থিমোচন করে আত্মআবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানবিক হয়ে ওঠে' (মাসুদুজ্জামান, ২০১২ : ২৯)। এরপর সে তার স্বামী-সন্তানদের প্রতি সনাতন দায়িত্ববোধে আর বিশ্বাসী হতে পারে না। এর বাইরে 'উচ্চতর' দায়িত্ব হলো 'নিজের প্রতি দায়িত্ব।' নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে নারীর মুক্তি নেই। তাই সে আর স্বামী টোরভাল্ড হেলমারের পোষা বউ (pet wife) হয়ে তার দয়ার উপর নির্ভরশীল হতে চায় না। এভাবেই নোরা আত্মসচেতন মানুষে রূপান্তরিত হয়। ইবসেন অবশ্য একে 'নারীমুক্তি' না বলে 'মানবমুক্তি' বলেই উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে রবীন্দ্রভাবনাতেও নারীমুক্তি ছিল মানবিকতারই অন্য নাম। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটি প্রায় একশ বছর আগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে লিখিত। সেখানেও মৃণালের আত্মসচেতন হতে সময় লেগেছিল। "ইবসেনের নোরার বিদ্রোহ তার স্বামীর বিরুদ্ধে আর মৃণালের বিদ্রোহ তার স্বামীর বিরুদ্ধে যতটা, তার অনেক বেশি সামাজিক প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে, যৌথ পরিবার ও তার জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে" (মজিরউদ্দীন, ১৯৯৪ : ১০৩)। জীবনের দুঃখ, বঞ্চনা, পারিবারিক হিংসা, মানসিক শোষণ আর বন্দিত্বের ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারে—

> তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলো
> (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৬)

এবারে সে নিজের জন্য বাঁচতে চায়। 'পতিই হচ্ছে স্ত্রীলোকের গতি মুক্তি সব' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫২)। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে মৃণাল আর আদর্শ-বাধ্য অবরুদ্ধ স্ত্রী হতে চায় না। 'কপালে যদি দুঃখ থাকে তো কেউ খণ্ডাতে পারবে না' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫২)। এমনি নিয়তির ওপর বিশ্বাসী হয়ে থাকে না পতিব্রতা বড় জায়ের মতো। এতদিন যে পরনির্ভরশীল সত্তা তাকে শুধু স্ত্রী করে রেখেছিল সে সত্তা থেকে তার উত্তরণ ঘটে। বিন্দুর মৃত্যুর পর সে দেখল, নারী হলেও ভগবান ওকে ত্যাগ করেননি, 'সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান — সেখানে বিন্দু কেবল বাঙালি ঘরের মেয়ে নয়, কেবল খুড়তুতো ভায়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল স্বামীর প্রবঞ্চিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৫৫)। মৃণাল উপলব্ধি করল, ঈশ্বর শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের। সে আরো উপলব্ধি করল সামাজিক নির্যাতনে আত্মহত্যা কোনো সামাজিক পরিবর্তনের সূচনা করে না। বিন্দুর বিন্দুবৎ জীবন মৃণালকে সেই উপলব্ধিই দেয় যে, জীবন-সংসার, রীতি-প্রথার এইসব আয়োজন কত তুচ্ছ। তবু, জীবনকে ত্যাগ করে নয়, জীবনের সঙ্গে 'লেগে থাকাই বেঁচে থাকা।' সংসারে ভালোবাসা পাবার এবং দেওয়ার পথ রুদ্ধ হলে মৃণাল এবার নিজেই নিজেকে ভালবাসে।

সাত

শুরুতে মৃণালকে নারীবাদী বলা হয়েছে। নারীবাদ একটি বিকশিত মতবাদ। 'ইউরোপে এনলাইটমেন্টের গর্ভ থেকে উত্থিত শেষ প্রকল্প হচ্ছে নারীবাদ' (আকতার, ২০১৪ : ১১০)। এটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিস্থিতি ও ইস্যুর ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়ে থাকে। নারীবাদের একটি সংজ্ঞায় বলা হয়েছে :

> নারীবাদ হচ্ছে, পরিবার, কর্মক্ষেত্র এবং সাধারণভাবে সমাজে বস্তুগত ও ভাবগত পর্যায়ে, নারীদের শ্রম, উদ্ভাবন শক্তি ও যৌনতার উপর পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, শোষণ ও নির্যাতন সম্পর্কে সচেতনতা এবং বর্তমান পরিস্থিতি পরিবর্তনের জন্য নারী ও পুরুষের সচেতন কার্যপরিচালন। (কমলা, ২০০২ : ৯)

নারীবাদ, জেন্ডার (gender) সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে বর্জন করে পুরুষতান্ত্রিক জ্ঞান ও মতাদর্শকে চ্যালেঞ্জ করে। নারীর ব্যক্তিসত্তার স্বাধীনতা, নারীর নারীত্ব এর আলোচিত বিষয়। "বিশেষ করে নারীর সনাতন পারিবারিক ভূমিকা — যেমন, কন্যা, ভগিনী, প্রেমিকা, স্ত্রী আর মা হিসেবে নারীকে সাহিত্যে কীভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে সে সব বিবেচনা করাই নারীবাদী সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য" (মাসুদুজ্জামান, ২০০৫ : ৩০)।

'প্রথম দিকের নারীবাদীরা নারী-পুরুষের তুলনামূলক অবস্থার বিবরণ তুলে ধরছিলেন' (মাসুদুজ্জামান, ২০০৫ : ৩৪)। নারীর পিছিয়ে পড়া করুণ অবস্থার জন্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজকেই দায়ী করা হয়। 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল চিঠির শুরুতে 'তুমি' বলে তার স্বামীকে সম্বোধন করে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু পরে তা 'তোমরা' তে রূপান্তরিত হয়। এই 'তোমরা' বলতে সেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজকে বোঝাচ্ছে। মৃণাল নিজে প্রথমে বিন্দুর নির্যাতনের প্রতি

সচেতন হয়েছে, পরে নিজের সাধ্য অনুযায়ী তাকে রক্ষার তাগিদ বোধ করেছে, এক্ষেত্রে কলেজে পড়া, স্বদেশি করা ভাই শরৎ-এর সহযোগিতাও চেয়েছে। বিন্দুকেও পুরীতে শ্রীক্ষেত্রে নিতে চেয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে পরবর্তীসময়ে আত্মবোধ-জাগ্রত মৃণাল সংসার ছাড়ে। 'বিন্দুর আর আসবার দরকার হল না, কিন্তু আমার দরকার ছিল' (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭: ৪৫৫)। সে বিদ্রোহী এবং সাহসী। 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃণালকে ভক্তিবাদের চোরাবালিতে ঠেলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃণালের বিদ্রোহকে জলো করে দিয়েছেন' (আহমদ, ২০০৩ : ১৭৩)। বিদ্রোহী মৃণাল খুড়িমার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে এসে মীরাবাঈ[১৪]-এর ভক্তিবাদী পথ ধরে হাঁটতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ যুগধর্মের প্রেক্ষাপটে তাকে ঈশ্বরের কাছে নিবেদনের মাধ্যমে তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখিয়েছেন। নারী বলেই কি সে ঈশ্বরের কাছে নিবেদিত হবে? এজন্য মৃণালকে কতটা বিদ্রোহী বা স্বাধীন বলা যায়, এটা প্রশ্নসাপেক্ষ। 'কিন্তু এদেশে ভক্তিবাদের ইতিহাস তো বিদ্রোহেরই ইতিহাস। চৈতন্যদেবের ভাব-বিপ্লবে সমাজে যে উথালপাতাল, তাতে আমরা মানবমুক্তির দিশা পাই' (সনৎকুমার, ২০১১ : ১৬৮)। সন্‌জীদা খাতুন রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার পর্যালোচনায় বলেছেন, 'জীবনের জটিল-বন্ধুর পথ পরিক্রমায় উপর্যুপরি আঘাতে পর্যুদস্ত অবস্থাতে এক সময়ে ভক্তিবাদী আস্তিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, সন্দেহ নেই। পরাধীন জাতি হিসেবে অপমানের আঘাতও সেই সময় এত প্রবল ছিল যে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন আদর্শকেই একান্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন' (সন্‌জীদা , ১৯৯৪ : ১০১)। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল শুধু 'ধর্মে মন হয়েছে' বলে ঘর ছাড়েনি, জীবনের সত্যরূপ অন্বেষায় সে ঘর ছেড়েছে। কিন্তু এরপর সে কীভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর হয়ে জীবনযাপন করবে তার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়নি। "তার চূড়ান্ত স্বেচ্ছামনোনীত পরিণতিটি ক্ষুদ্র পারিবারিক বৃত্ত থেকে মুক্ত হয়ে স্বনির্বাচিত এক বৃহৎ-বৃত্তে বন্দি হওয়ারই নামান্তর" (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৫৭)। এতদসত্ত্বেও 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের প্রেক্ষাপটে বলা যায়, মৃণালের ব্যক্তিসত্তার পূর্ণতার জন্যই এই অজানার পথে যাত্রা। সন্‌জীদা খাতুন তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন :

> মানুষের অন্তরে লালিত আদর্শের বোধই মানবযাত্রার নিয়ন্তা। আদর্শের প্রতিমা গড়তে 'শ্রেয়' সংক্রান্ত ধারণাগুলোকে তিল তিল করে এনে সাজাতে হয়। ঐ 'ধারণা'র হদিস পাওয়া যায় পূর্বপূর্ব মহান যাত্রীর জীবনধারা লক্ষ করে আর আপন জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত পরম বোধসমূহ থেকে। তাকেই ধ্রুবতারা করে তারই নির্দেশে দিক নির্ণয় করে পথ চলে মানুষ। মানবরচিত এই আদর্শের পরিচয় আমাদের দ্বিতীয় সত্তা হিসেবে। (সন্‌জীদা, ১৯৯৪ : ৯৮)

এই দ্বিতীয় সত্তার ঐশ্বর্যে মৃণাল আত্মবোধে জাগ্রত হয়। প্রকৃতপক্ষে নারীবাদ নারীদের মুক্ত ও ক্ষমতায়িত করে। হীনম্মন্যতা থেকে মুক্তি দিয়ে কথা বলার অধিকার শেখায়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পের শুরুতে বিশ শতকের বাংলাদেশের পত্রলিখন-রীতি অনুযায়ী 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্বোধনে লিখলেও পত্রশেষে 'তোমাদের চরণতলাশ্রয়ছিন্ন' এই "সমস্তপদটিতেই সংকেতিত হয়েছে দ্রোহিণী মৃণালের দীর্ঘকাল পুঞ্জীভূত অপমান-লাঞ্ছনা ও বন্দিজীবনের বিরুদ্ধে সমুপযুক্ত ঘৃণা ও ধিক্কার" (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৫৫)। সে বোঝাতে চেয়েছে এবারে সে তার নিজেরই কর্তা, নিজেই নিজের জীবনের রূপকার।

আট

মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভ্যতার বিবর্তনে নারীর অবস্থান ও পরিবর্তন সম্পর্কে উৎসুক ছিলেন। সনাতন হিন্দু সভ্যতার প্রতি আকর্ষণের পাশাপাশি পাশ্চাত্য রেনেসাঁসীয় আলোকবর্তিকার প্রতিও অনুরক্ত তিনি। অন্যান্য রচনার তুলনায় ছোটগল্পেই নারীভাবনার আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার উদ্ভাস অনেক স্বচ্ছ ও ব্যাপক। ১৯১৪ সালেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নারীমুক্তি-চিন্তা আধুনিক রূপ নেয়, যার বীজ *খাতা* (১৮৮০) ছোটগল্পে সুপ্ত ছিল। 'নারীর ব্যক্তিসত্তার মুক্তি নিশ্চিত করতে *সবুজপত্র* পর্ব থেকে রবীন্দ্রগল্পের নায়িকারা প্রথম দিকে প্রতিবাদ জানিয়েছে বিভিন্নভাবে, তবে প্রতিবাদ ঘরের চৌহদ্দি থেকে। কিন্তু ব্যক্তিত্ব সবার সমান নয়, প্রতিবাদের ধারাও সবার সমান নয়" (আহমদ, ২০০৩ : ১৭৪)। 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পের চন্দরা, 'বোষ্টমী' (আষাঢ়, ১৩২১) গল্পের বোষ্টমী, 'হৈমন্তী' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) গল্পের হৈমন্তী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাকরুদ্ধ ও অভিমানী। 'দেনাপাওনা' (১২৯৮) গল্পের নিরুপমা দুঃখ ভোগ করেছে, প্রশ্ন তোলেনি। 'অপরিচিতা' (১৩২১) গল্পের কল্যাণী, 'পয়লা নম্বর' (আষাঢ়, ১৩২৪) গল্পের অনিলা সংসারের বিরুদ্ধে নীরব বিদ্রোহ জানিয়েছে। চন্দরা পুরুষতান্ত্রিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৃত্যুকে মুক্তি মনে করেছিল। কিছু এক্ষেত্রে মৃণাল ব্যতিক্রম। "মৃণাল বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিদ্রোহিণী — মেরি উইলসটন ক্রফট" (মজিরউদ্দীন, ১৯৯৪ : ১০৩)। যে ইউরোপে উনিশ শতকের পূর্বে নারীর মর্যাদা বলতে কিছুই ছিলনা, সে ইউরোপের মাটিতে দাঁড়িয়ে মেরি সর্বপ্রথম ঘোষণা করেছিলেন নারী অধিকারের মহা ইশতেহার[১৫]। পরবর্তীকালে ইবসেনের নোরার মধ্যে নারী প্রগতিবাদের সেই রূপ দেখতে পাই। বাংলা সাহিত্যে মৃণাল প্রথম আত্মআবিষ্কারের মধ্য দিয়ে সমগ্র বঞ্চিত নারীর হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে 'স্ত্রীর পত্রে'। সংসারের 'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা' এই ঘূর্ণিপাকে হারিয়ে গিয়েছিল সে। গলির অন্ধকার থেকে মুক্ত হয়ে উন্মুক্ত আকাশের নিচে জীবনের হাইওয়েতে এসে সে অনুধাবন করে, নিজের পথ নিজেকেই করে নিতে হয়। অন্যের পরিচয়ে নয়, নিজের পরিচয়ে বাঁচতে হয়। এভাবেই "নারীর 'আমি' হয় মহিমান্বিত, আমি-চিত্তই হয়ে ওঠে সৃষ্টির প্রাঙ্গণ" (আকতার, ২০১৪ : ১১৩)। তাই আজ মৃণাল নিজেকে মানুষ শুধু নয়, কবি বলে স্বীকৃতি দেয় :

> আমার একটা জিনিস তোমাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল। সেটা তোমরা কেউ জাননি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুম। সে ছাইপাঁশ যাই হোক-না। সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল ওঠেনি। সেইখানে আমার মুক্তি, সেইখানে আমি আমি। আমার মধ্যে যা-কিছু তোমাদের মেজোবউকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পার নি; **আমি যে কবি সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়ে নি** । (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৯৭ : ৪৪৯)।

'বৃহৎ পরিবর্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক', বিন্দুর সান্নিধ্যে সে বৃহৎ বল অনুভব করেছিল বলেই মৃণাল ঘরের বাইরে এসে সাহসী হয়ে স্বামীকে চিঠি লেখে। আমিত্বের উপলব্ধিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়দীপ্ত চিঠি। "আমিত্বের খোলস, মধ্যবিত্তের খোলস-নির্মোক যতই মূল্যবান, দুর্লভ, মানানসই বা স্বর্ণকান্তি হোক না কেন, খোলস ভেঙে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য কবি।... তারপরই শুরু হয় প্রকৃত সংঘাত, সব কিছুতেই নিজের অস্তিত্ব জানান

দেয়ার ঘনঘোর সংগ্রাম" (রফিক, ২০১১ : ৮৭)। মৃণাল সবে শুরু করেছে, কে জানে এরপর 'হয়ে ওঠার' প্রক্রিয়ায় সে হয়তো একজন কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে। রবীন্দ্রনাথ তাকে 'তীর্থ করতে' শ্রীক্ষেত্রের আশ্রমে প্রাথমিক অবস্থান দেখিয়েছেন, কিন্তু তার সমুখে রয়েছে 'নীল সমুদ্র'। সে সমুদ্রের পরিস্নাত হাওয়ায় 'জীবনের জয়পতাকা' ওড়াবার উৎসবে এগিয়ে যাবে। তার আর ভয় কী? 'সম্মুখে তার জীবনমরণ সকল একাকার/ অজানিতের ভয় কিছু নেই আর'[১৬]। বিন্দুর সাহচর্য আর ভালোবাসাতেই সে আত্মশক্তিতে জাগ্রত হয়েছে। স্বর্গ থেকে আসা হৃদয়ের জগতের বসন্তকে চিনেছে। সহযোগিতা, সহমর্মিতা আর সমকক্ষতার গুণে সমৃদ্ধ হয়েছে মৃণাল। বিন্দুর মর্মান্তিক বিয়োগান্তক ঘটনায় সে বুঝতে পারে সংসারে নারীর বিন্দুমাত্র মর্যাদা নেই। তাই সে সাহসী এবং প্রতিবাদী। এই প্রতিবাদী সত্তা মানুষের চিরকালীন সত্তা। নিজের এই স্বাধীন সত্তার অবমাননা তাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল। এজন্যই সে "নির্দ্বিধায় স্বামী-আইডিয়া অস্বীকার করে জগৎ ও জীবনের সাথে বেঁচে থাকার নতুন অর্থ আবিষ্কার করেছে" (আকরম, ১৩৯৪ : ৩২৩)। মৃণালের ব্যক্তিসত্তার এ মুক্তি যেন ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত আধুনিক মূল্যবোধেরই পরিচায়ক। যেখানে নারী নিজেকে মানুষ ভাবতে শিখেছে।

নয়

মানুষের আত্মপরিচয়ের মূল কথা 'নিজেকে জানো' এবং 'জানাও'। প্রকাশই মানবধর্ম। মানুষের মধ্যেই বীজের মতো কিছু শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে, যা তাকে উদ্দীপনা জুগিয়ে আশায় বাঁচতে শেখায়। যথার্থ আলো-বাতাস আর স্থানের স্পর্শে সে শক্তি প্রাণরসে অঙ্কুরিত হয় আশাবাদের পল্লবে। মানুষ মাত্রেই স্রষ্টা, সংসারের নানা ক্ষেত্রে সে তার সৃজনশীলতার প্রকাশে ব্যাকুল। এই মানুষের ভেতরেই আছে এক ঐশ্বরিক সত্তা, যার অনুভবে মানুষ হয়ে ওঠে কোবিদ। নিজের মনে ও অন্যের প্রাণের মধ্যে সর্বোপরি জগতের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশই কবিত্ব। মৃণালও সেই সত্তার অনুভবে কবি হয়ে ওঠে। বিয়ের পর কলকাতার নগরজীবনের বিচ্ছিন্নতা, সংসারজীবনের একাকিত্ব, মাতৃত্বের বেদনা, নারীর অসহায়ত্ব, পারিপার্শ্বিকতা প্রভৃতি মৃণালকে সংবেদনশীল করে তোলে। মৃণাল অনাদরে বেড়ে-ওঠা সেই ছাই-চাপা আগুন যার উত্তাপ প্রকাশে সে আকুল। কিন্তু তার নিজের কোনো পরিচয় নেই, ঘর নেই। তাই সে অসম্মানের অন্দরমহলের চৌকাঠ পেরিয়ে বেরিয়ে আসে, বেরিয়ে এসে অনুভব করে তারও স্বাধীনভাবে নিজের পরিচয়ে বাঁচার অধিকার আছে। এই স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা, বিদ্রোহী সত্তার অনুভবে সে বুঝতে পারে, সেও সমাজের অর্ধেক অংশ, মানুষ। আত্মমর্যাদাবোধে আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আনন্দে বাঁচার নাম মুক্তি। মুক্তি অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক বৈষম্য, সামাজিক সংস্কার লোকধর্ম প্রভৃতি। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালও সেই মুক্তিপিয়াসী পথিক। অবদমন, অনুশাসন অর্থনৈতিক বৈষম্য বা মেধার দীনতা থেকে মুক্তিকেই প্রকৃত মুক্তি বলা হয়। আজ এই একবিংশ শতাব্দীতেও নিরন্তর সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে নারী, কিন্তু গন্তব্য এখনো অনেক দূরে। আত্মমর্যাদা নিয়ে আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠুক সমাজের অর্ধেক মৃণালেরা।

টীকা

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প রচনার কাল ১৮৭৭-১৯৪১। প্রথম গল্প *ভিখারিনী* (১৮৭৭) এবং শেষ গল্প *মুসলমানীর গল্প* (১৯৪১)।

২. "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *গৃহদাহ* উপন্যাসের প্রান্তিকে মহিমের শেষ আশ্রয়স্থল মৃণাল। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে মৃণাল সংস্কারপ্রবণ বিধবা হলেও তীক্ষ্ণদৃষ্টি রমণী। মহিম মৃণালকে বলেছে : 'অচলা আমাকে একটা আশ্রয়ের কথা জিজ্ঞেস করেছিল মৃণাল, কিন্তু আমি তার জবাব দিতে পারিনি। তোমার কাছে হয়তো সে একটা উত্তর পেতেও পারে।' (শরৎ, ১৯৯৯ : ৪৬৬) শরৎচন্দ্রের মৃণাল এভাবেই ঔপন্যাসিকের প্রার্থিত সামগ্রিক মূল্যবোধ রক্ষা করেছিল" (সৌমিত্র, ২০১২ : ৮৭)।

৩. খুলনার কাছে দক্ষিণডিহি গ্রামের অধিবাসী ভবতারিণী দেবীর (১৮৭৪-১৯০২) সাথে রবীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ১৮৮৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে উনত্রিশ বছর বয়সী মৃণালিনী দেবীকে হারান।

৪. ক. রবীন্দ্রনাথ ১৫-১৬ বছর বয়সে *কবিকাহিনী* লিখেছেন। '*কবিকাহিনী*র নায়ক কবি শূন্য হৃদয়ে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ান। একদিন অপরাহ্নে শ্রান্ত হৃদয়ে এক বৃক্ষতলে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে একটি বালিকা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালিকার নিকট কবি আপনার হৃদয়ের কত কথা বলিয়া গেলেন, এতদিন পরে তাঁহার মনে হইল হৃদয় যেন একটু জুড়াইল। বালিকার নাম নলিনী, রবীন্দ্রনাথের এক অতি প্রিয় নাম।... বালিকা তাহার সমস্ত ভালবাসা দিয়াও কবির মন পাইল না। মনের ভিতরের অশান্তি কিছুতেই মিটিল না তখন কবি দেশভ্রমণে বাহির হইলেন।... এদিকে বনে নলিনী মরণদশায় উপস্থিত। বহুকাল পরে কবি নলিনীর কাছে যখন আসিলেন সে তখন চিরনিদ্রায় মগ্ন। কাছে থাকিতে বুঝেন নাই যে তিনি নলিনীকেই ভালোবাসিয়াছিলেন, দূরে গিয়া তাঁহার কাছে বালিকার প্রেম প্রকাশিত হয় নাই' (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ৭৮)। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'নলিনী চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী'। এছাড়া কবি মূর (Moore) এর Odes to Anacrion কবিতার অনুবাদেও নলিনী : 'ও আমার নলিনী লো লাজমাখা নলিনী/অনেকের আঁখি 'পরে সৌন্দর্য বিরাজ করে/তোর আঁখি পরে প্রেম-নলিনী লো নলিনী।' (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ৮৯)

খ. ১৮৭৮ সালে বিলেত যাত্রাপথে আত্মারাম পাণ্ডুরঙের মেয়ে আনা তরখড়-এর ওপর দায়িত্ব পড়েছিলো রবীন্দ্রনাথকে খানিকটা ইংরেজ করে তোলার। 'আনা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দু'বছরের বড়ো। কিন্তু অমন সুদর্শন গায়কের প্রেমে পড়তে দেরি হয়নি মোটেই। রবীন্দ্রনাথও ইংরেজি শেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন না। বরং কবিতা লিখে গান রচনা করে আনাকে 'নলিনী' নাম দিয়ে মুগ্ধ করতেই বেশি আগ্রহ দেখালেন' (গোলাম, ২০১০ : ৫১)।

গ. রবীন্দ্রনাথের প্রথম অকিঞ্চিতকর গদ্য-নাটক 'নলিনী'। (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ১৯২)

৫. ক. *সবুজপত্র* পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ৫৩তম জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ ১৩২১/ ১৯১৪)। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের বিদ্রোহধ্বজা উড়িল সবুজপত্রের মধ্যে'। এতেই রবীন্দ্রনাথের নারী-বিদ্রোহাত্মক গল্পগুলো প্রকাশিত হয়।

"১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে শান্তিনিকেতনে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে কবি-সম্বর্ধনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাষণের প্রতিক্রিয়ায় যে হলাহল বাংলা সাময়িক সাহিত্যে উছলিয়া উঠে তাহাতে কবি অন্তরে অন্তরে জর্জরিত হন; এবং স্থির করেন যে সাময়িকপত্রের জন্য কিছু লিখিবেন না। ইতিমধ্যে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে একখানি নূতন ধরনের পত্রিকা প্রকাশের আলোচনা চলিতেছিল।... সমস্ত শুনিয়া কবি প্রমথ চৌধুরীকে বলিয়া পাঠান যে প্রমথ যদি পত্রিকা বাহির করেন তবে তিনি লেখা দিবেন" (প্রভাতকুমার, ১৪১৭ : ৪৫৫)।

৬. '*স্ত্রীর পত্র* সেই সৃজনশীল রচনা, যেখানে প্রথম চলিত-ভাষারীতি রবীন্দ্রগদ্যের অবলম্বন হয়েছে' (ভীষ্মদেব, ১৪১২ : ৫৩)।

৭. রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনার বহুমাত্রিকতার কিছু দৃষ্টান্ত নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. 'মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০২ : ১৫৭)।

খ. "রবীন্দ্রনাথের মনস্তত্ত্বে ভারতীয় বনাম ইয়োরোপীয় প্রতিতুলনার ব্যাপারটি প্রথমাবধি বদ্ধমূল। তিনি একটি মুক্ত সমাজ আকাঙ্ক্ষা করেন, যাকে উদার মানবতাবাদীও বলা যায়, তার আদর্শ পেয়েছেন ইয়োরোপের সান্নিধ্যে। এই বোধ থেকেই তিনি সমকালীন হিন্দু পরিবার কাঠামো, দাম্পত্য গঠন ও নারীর রুদ্ধ অবস্থান নিয়ে প্রতিবাদী। হিন্দু বিবাহের ধরন নিয়ে সমকালে যে বিতর্ক ছিল তাতে রবীন্দ্রনাথও অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, নারী পুরুষের সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও ধর্মনৈতিক অবস্থানের কারণেই বৈষম্য নিশ্চিত এবং এই বৈষম্যের কারণে দাম্পত্যে নারী বাধ্যতামূলকভাবে পুরুষের নিম্নস্তরে সংসার যাপন করে। বিয়ের সময়, সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী কোনো বাস্তব সুবিধা লাভ করে না বিধায় দাম্পত্য শেষ পর্যন্ত পুরুষ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়" (সিরাজ, ২০১২ : ৬)।

গ. "এ কথা সত্য, রবীন্দ্রনাথ নারী বা পুরুষ কোনো এক পক্ষের আধিপত্য স্বীকার করতে চাননি। তিনি সম্পূরকতা ধর্মে বিশ্বাসী, নারী পুরুষ যে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন এই মতই পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রকৃতিতে নারী বা পুরুষ থাকবে, থাকতেই হবে, কেননা কোনো এক পক্ষের দ্বারা এককভাবে প্রকৃতি সংরক্ষণ অসম্ভব। এতে পার্থক্য থাকবে, একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ক্ষতিপূরণের নিয়ম'। তাঁর মতে, শারীরিকভাবে পুরুষ বলশালী হলেও মেয়েরা রূপে শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ হলেও নারী শ্রেষ্ঠ হৃদয়ের ধর্মে এবং 'তাই স্ত্রী পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে।' কিন্তু পরে রবীন্দ্রনাথ এই সম্পূরকতাকে খুব একটা প্রাধান্য দেননি" (সিরাজ, ২০১২ : ১৮)।

ঘ. "কেবল গার্হস্থ্য দরে নারীকে আর বিবেচনা করা যাবে না বলেই মনে করেন রবীন্দ্রনাথ; তাদের একটি 'সার্বভৌমিক' মূল্য তৈরি হবেই। নারী বিশ্বের উন্মুক্ত প্রান্তরে আসবে, সেই অনুপাতে তাদের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, 'পৃথিবীতে নতুন যুগ এসেছে।' পুরুষকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে মেয়েদের ভাবনার যোগ ঘটাতে হবে ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আজ ভাণ্ডারের দ্বার খুলেছে" (সিরাজ, ২০১২ : ২৯)।

ঙ. "রবীন্দ্রনাথকে নারীমুক্তির প্রত্যক্ষ প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করতে না চাইলেও তাকে নারী প্রগতিবিরোধী বলা যাবে না। কারণ রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা ক্রমউত্তরণের পথ ধরে নারীর অসহায়তার পক্ষে দাঁড়িয়ে নারী নির্যাতন ও নারীর গৃহবন্দিত্বের বিরুদ্ধে যুক্তিগ্রাহ্য মতামত তুলে ধরেছে" (আহমদ, ২০০৩ : ৫৭)।

৮. নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর (কার্তিক, ১৩২০)। প্রতি বছর সুইডিশ একাডেমি নভেম্বর মাসের ২য় বৃহস্পতিবার এ পুরস্কার ঘোষণা করে।

৯. *সবুজপত্র* প্রকাশের কয়েকমাস পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় 'নারায়ণ' পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পালের 'মৃণালের কথা' (অগ্রহায়ণ ১৩২১) প্রকাশিত হয়। এতে রবীন্দ্রনাথের মৃণাল গৃহত্যাগ করে সমাজ বিগর্হিত কাজ করেছে বলে তীব্র সমালোচনা করা হয়। এছাড়া ললিতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বামীর পত্র' নামে আরেকটি সমালোচনামূলক রচনা প্রকাশিত হয়। (মজিরউদ্দীন, ১৯৯৪ : ১০৩)

১০. 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে পরিবারের ক্ষমতাকেন্দ্র শাশুড়ি বড়ো বউয়ের রূপের অভাব পূরণ কিংবা দুই বধূর মধ্যে স্থায়ী বিভেদ তৈরির মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা নিজের হাতে রাখার কৌশলে গ্রাম থেকে সুন্দরী নারী মেজোবউ সংগ্রহ করে আনে। নারীর রূপ এখানে নিজের নয়, পরিবার বা সমাজের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারের সম্পত্তি' (সিরাজ, ২০১২ : ৮৩)।

১১. "ফরাসী ও বিশ্বনারীবাদের মহত্তম তাত্ত্বিক সিমোন দ্যা ব্যোভেয়ার (১৯০৮-১৯৮৬)। তিনি নারীবাদী সাহিত্য সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন 'দ্বিতীয় লিঙ্গ'- এ বইয়ে। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য

হচ্ছে যে ইতিহাস ভরে নারী পরিণত হয়েছে পুরুষের সামগ্রীতে, নারীকে তৈরি করা হয়েছে পুরুষের 'অপর' রূপে, অস্বীকার করা হয়েছে তার নিজস্বতা এবং নিজ দায়িত্বভারের অধিকার। বারবার তিনি সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদী পরিভাষায় বলেছেন, পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ নারীকে দেখে সীমাবদ্ধ আর পুরুষকে অসীম বা সীমাতিক্রান্ত রূপে। এটি পরবর্তী নারীবাদী সমস্ত চিন্তা ও গ্রন্থের জননী" (হুমায়ুন, ২০০৫ : ৩৮৪)।

১২. সেলিনা হোসেন-এর মতে, 'সামগ্রিকভাবে সমাজে অধিকারের প্রশ্নে পুরুষের তুলনায় নারী বৈষম্যের শিকার। সমাজ কাঠামোর নানা উপকরণের দ্বারা বিভিন্নভাবে বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো তৈরি হয়। এ সত্যটি জেনেও যারা প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক পুরুষকে সমান হিসেবে বিবেচনা করার কথা বলেন, তারা পরোক্ষভাবে জেন্ডার বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখার পক্ষেই অবস্থান নেন' (সেলিনা, ২০০৬ : ৫৮১)।

১৩. ইউরোপীয় বাস্তববাদী নাট্যধারার জনক নরওয়েজিয়ান নাট্যকার হেনরিক ইবসেন (১৮২৮ - ১৯০৬)।

১৪. সোনিয়া নিশাত আমিন উল্লেখ করেন, 'মীরাবাঈয়ের জীবন ইতিহাসের চেয়ে কিংবদন্তি দ্বারা আচ্ছাদিত। তিনি ভারত উপমহাদেশে ভক্তিমূলক বৈষ্ণবদর্শনের এক অবিস্মরণীয় নাম। তার খ্যাতি তার কবিতা ও গানের উপর প্রতিষ্ঠিত। শৈশব থেকেই মীরা কৃষ্ণ আরাধনায় আকৃষ্ট হন এবং কৈশোরে ভক্তিমূলক গান রচনা শুরু করেন।... একটি ভাষ্য অনুযায়ী, স্বামীর মৃত্যুর পরে মীরা মন্দিরে বসবাস শুরু করে কবিতা ও গানে মনোনিবেশ করেন। অন্য ভাষ্য অনুযায়ী, স্বামীর জীবদ্দশাতেই বিদ্রোহী মীরা পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো থেকে বের হয়ে প্রাসাদ ছেড়ে সাধিকা বেশে বৃন্দাবনে আশ্রয় নেন এবং সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ভজন শুরু করেন। ... কবি ও গীতিকার ছাড়াও আজ মীরা সন্ত ও স্বাধীন মনীষী হিসেবে বন্দিত' (সেলিনা, ২০০৬ : ৩৫১)।

১৫. নারীবাদের জননী মেরি ওলস্টোনক্রাফ্‌ট (১৭৫৯-১৭৯২) লন্ডনের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ৩৩ বছর বয়সে তিনি নারীমুক্তি আন্দোলনের প্রথম মহা ইশতেহার Vindication of the Rights of women (1792) রচনা করেন। তিনি নির্ভীকভাবে দাবী করেন, নারী কোনো যৌনপ্রাণী নয়, সেও বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ, তাকে স্বাধিকার দিতে হবে। এছাড়া তিনি অন্যতম প্রথম ব্যক্তি যিনি সব শ্রেণির নারী ও পুরুষের জন্য অবৈতনিক ও সার্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন।

১৬. *পলাতকা*, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

গ্রন্থপঞ্জি

অনীক মাহমুদ (২০০০)। *রবীন্দ্র ছোটগল্পে জীবনবোধ ও চরিত্রচিত্রণ*, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা।

আবুল হাসনাত [সম্পাদিত] (২০০১)। *নারীর কথা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহমদ রফিক (২০০৩)। *দ্রোহে ও সমর্পণে*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা।

কমলা ভাসিন, নিঘাত সাঈদ খান (২০০৩)। *নারীবাদ বিষয়ে কিছু প্রশ্নএবং দক্ষিণ এশিয়ায় এর প্রাসঙ্গিকতা* [অনুবাদ ফওজিয়া খোন্দকার ইভা], প্রশিকা, ঢাকা।

নীপা কর (২০০৪)। *নারী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে*, পুস্তক বিপণী, কলকাতা ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৪১৭)। *রবীন্দ্রজীবনী*, ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা।

ফাতেমা কাওসার (২০০৩)। *বাংলা সাহিত্যের কথকতা*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

বেগম আকতার কামাল (২০১৪)। *রবীন্দ্রনাথ যেথায় যত আলো*, অবসর, ঢাকা।

ভীষ্মদেব চৌধুরী (১৪১২)। *দু-চারিটি অশ্রুজল : রবীন্দ্রগল্পের ভিন্নপাঠ*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।

মাহফুজা হিলালী (২০১১)। *রবীন্দ্রনাথ : 'স্ত্রীর পত্র'*, মূর্ধন্য, ঢাকা

মুহম্মদ মজিরুদ্দীন মিয়া (১৯৯৪)। *গল্পগুচ্ছের সমাজ ও জীবন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মোহাম্মদ রফিক (২০১১)। *জীবনানন্দ*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৩৯৭)। *গল্পগুচ্ছ*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০২)। *কালান্তর*, আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৪০৬)। *গীতবিতান*, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৪)। *যোগাযোগ*, রহমান বুকস, ঢাকা।

শঙ্খ ঘোষ (২০১৪)। *নির্বাচিত প্রবন্ধ নানা প্রসঙ্গ*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সন্‌জীদা খাতুন (১৯৯৪)। রবীন্দ্রনাথ *বিবিধ সন্ধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সনৎকুমার সাহা (২০১১)। *কবিতা-অকবিতা রবীন্দ্রনাথ*, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা।

সর্বাণী বিশ্বাস (২০০৭)। *রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী*, পুনশ্চ, কলকাতা।

সিরাজ সালেকীন (২০১২)। *রবীন্দ্রচেতনায় নারী*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

সেলিনা হোসেন, মাসুদুজ্জামান [সম্পাদিত] (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*। ফারিয়া লারা ফাউন্ডেশন, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

সৈয়দ আকরম হোসেন (১৩৯৪)। *রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ শামসুল হক (২০১৪)। *তিন পয়সার জ্যোছনা*, প্রথমা, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (২০০৫)। *নারী*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন কবির (২০০০)। *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর* [অনুবাদ, ভূমিকা, টীকা; হায়াৎ মামুদ]। একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ, ঢাকা।

প্রবন্ধপঞ্জি

গোলাম মুরশিদ *(২০১০)*। 'ভালোবাসার কাঙাল : রবীন্দ্রনাথ', কালি ও কলম, ৭ম বর্ষ, সংখ্যা- ১১, পৃষ্ঠা ৪৮-৫৯

মাসুদুজ্জামান (২০০৫)। 'ইবসেন, নারীবাদ ও নোরা। সাহিত্য পত্রিকা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৭ বর্ষ, সংখ্যা-১, পৃষ্ঠা ২৯-৪৭

মোঃ মাসুদ আলম (২০১৪)। '*সূর্য-দীঘল বাড়ী* উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী চেতনা';, সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৫১ বর্ষ, সংখ্যা-৩, পৃষ্ঠা ১৬৫-১৭৫

সৌমিত্র শেখর (২০১২)। 'দুই মৃণাল : রবীন্দ্র বিতর্কের এক অনালোচিত অধ্যায়', সাহিত্য পত্রিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৯ বর্ষ, সংখ্যা-৩, পৃষ্ঠা ৮৭-৯৭

সৌভিক রেজা (২০০৬)। 'জ্যাঁ পল সার্ত্রের অস্তিত্ববাদী সাহিত্যভাবনা ও চাঁদের অমাবস্যা', উলুখাগড়া, ঢাকা, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৩, পৃষ্ঠা ২০৫-২২৫